১০০ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর

আবদুল ওয়াহাব

একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর

আবদুল ওয়াহাব বি.এ. বি.টি.
প্রধান শিক্ষক সাহাপুর প্রাঃ বিদ্যালয় হরিশ্চন্দ্রপুর
দক্ষিণচক্র, মালদহ

সহযোগিতায় ঃ
শ্রী সুনীল কুমার মৈত্র,
মৈত্র বাড়ী, তুলসীহাটা, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।

লেখকের অন্যান্য বই—

সর্বজন শ্রদ্ধেয় অকৃতদার সমাজসেবী নিরলস মানবদরদী।

শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত

যুগে যুগে মহান পুরুষদের বানী ও নীতি সম্ভার।

একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর।

মালদহ জেলার লোকসংস্কৃতি (প্রস্তাবিত)

প্রথম প্রকাশ মালদহ জেলা বইমেলা,
উদ্বোধক শ্রী নিমাই মাল, মাননীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার
৭ই জানুয়ারী, ২০০৪ দ্বিতীয় সংস্করণ, সংযোজন ও পরিমার্জিত,
প্রকাশ - ১লা জানুয়ারী, ২০০৬

মূল্য কুড়ি টাকা মাত্র।

প্রকাশক ঃ শ্রী সনৎ কুমার সুকুল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।

"একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর" মালদহ জেলা সংগ্রামী জেলা। যুগে যুগে হিন্দু মুসলমানের রাজধানী হয়েছে গৌড়, পাণ্ডুয়া ও আদিনায়। হরিশ্চন্দ্রপুর জুগিয়েছে প্রেরণা। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সর্ব আন্দোলনে এগিয়ে থাকে হরিশ্চন্দ্রপুর। মালদহ বললেই আগে মনে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর। তাই হরিশ্চন্দ্রপুরের একশত বছরের ইতিহাস লিখতে ব্রতী হয়েছি। এ প্রবন্ধটি যদি হরিশ্চন্দ্রপুর ও মালদহ জেলার বর্ত্তমান ও আগামী প্রজন্মদের কাজে লাগে ও তাদেরকে উজ্জীবিত করে তবে আমার এ শ্রম সার্থক হবে।

যাদের ঐকান্তিক আগ্রহ, উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে বইখানি লিখতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে সে প্রাজ্ঞ, সুহৃদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সর্বজন শ্রদ্ধেয় অকৃতদার সমাজসেবী মানবদরদী দুজন কৃতী সন্তান শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র ও প্রয়াত আবদুল বাসেদ মিঞা এই গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের করকমলে "একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর প্রবন্ধটি শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পিত। এই প্রবন্ধে যদি দ্বিতীয় সংস্করণেও কোন ভুল তথ্য থাকে তবে পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ যে, পরবর্তী তৃতীয় সংস্করণে শুদ্ধ করে নেবার চেষ্টা করব।

বিনীত লেখক

আবদুলওয়াহাব
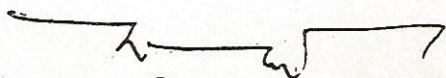
মাননীয়, আবদুলওয়াহাব
প্রধান শিক্ষক,
সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
হরিশ্চন্দ্রপুর, দক্ষিণ চক্র, মালদহ।

"একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর" প্রবন্ধটির লেখক হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্রের সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। "একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর" প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে তিনি যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করে প্রবন্ধটির সমৃদ্ধি বিকাশ ঘটিয়েছেন তা হরিশ্চন্দ্রপুর ও মালদহ জেলার বর্ত্তমান ও আগামী প্রজন্মদের ভীষণ কাজে লাগবে। তিনি ইতোমধ্যে দুটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এটি তার তৃতীয় প্রকাশ। যেভাবে তিনি তার লেখনির মাধ্যমে বিশেষতঃ হরিশ্চন্দ্রপুর ও মালদহ জেলাবাসীকে পথ দেখাতে এগিয়েছেন তাতে আমি ভীষণ গর্বিত ও আনন্দিত এবং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তিনি আমাদের মালদহ জেলাবাসীর বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের রত্ন। তিনি বর্ত্তমান ও আগামী জীবনে যেন তার লেখার মাধ্যমে বেঁচে থাকেন এ আশির্বাদই রাখছি।

৫ই নভেম্বর, ২০০৩

সঞ্জীব রায়
চেয়ারম্যান
মালদহ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

মাননীয় আব্দুল ওয়াহাব
প্রধান শিক্ষক
সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
হরিশ্চন্দ্রপুর, দক্ষিণ চক্র, মালদা

"একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর" প্রবন্ধটি পড়ে ভীষণ আনন্দিত হলাম। তিনি যে কঠোর সাধনা করে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশ করলেন । তা প্রশংসার দাবি রাখে।

আশা করি প্রবন্ধটি পড়ে সকলে উপকৃত হবেন।

৫ ই নভেম্বর ২০০৩
শ্রী সরোজ কুমার দেব

সরোজ দেব

সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক
মালদহ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

শ্রদ্ধেয় লেখক আব্দুল ওয়াহাব সাহেব,
প্রধান শিক্ষক, সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্র, মালদহ

দুর্গম সংসার সমুদ্রে পাড়ী দেওয়া অবস্থায় সমাজের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হওয়া সত্যিই মহত্বের দাবী রাখে। আপনার লেখা '১০০ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর', 'মহান পুরুষদের বানী ও নীতি সম্ভার'— বইগুলি পাঠান্তে এটাই অনুভূত হ'ল।

অতঃপর শুনলাম "মালদা জেলার লোকসংস্কৃতি" শিরোনামে আরও একটি নুতন বই ছাপাতে উদ্যোগী হয়েছেন। শুনে আনন্দিত হ'লাম। আপনার শ্রম সার্থক হোক কামনা করি ও অভিনন্দন জানাই সমাজে সংস্কৃতির জগতে নুতনত্বের সংযোজনের নিমিত্ত।

ধন্যবাদান্তে
মোন্নাহ্ মহঃ নজরুল ইসলাম
ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার
হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক উন্নয়ন
বারদুয়ারী, মালদা

স্থায়ী ঠিকানা ঃ
গ্রাম ও পোঃ হরহরি
থানা সাগরদিঘী
জেলা - মুর্শিদাবাদ।

"একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর" প্রবন্ধটির লেখক আব্দুল ওয়াহাব হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্রের সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁর লেখা প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্রপুরের একশ বছরের ইতিহাসে যে সমস্ত তথ্যগুলি তিনি কঠোর সাধনা করে উপবিষ্ট করেছেন এবং প্রবন্ধটি প্রকাশ করলেন তাতে আমি ভীষণ আনন্দিত ও গর্বিত। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে করি তাঁর প্রবন্ধে যদি কোন ভুল তথ্য থাকে তবে তাঁকে পরবর্ত্তী সংস্করনে শুদ্ধ করার পরামর্শ দিচ্ছি। আরো উল্লেখ্য যে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর ও মালদহ্ জেলার আগামী প্রজন্মকে তাঁর প্রবন্ধ মারফৎ অনেক অজানা জিনিষকে জানার সুযোগ করে দিলেন। আরো উল্লেখ্য যে, যে সকল গুণমুগ্ধ ব্যক্তি বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তাকে সহযোগীতা করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই প্রসঙ্গে পাঠক পাঠিকাবৃন্দের অনুরোধ করছি যদি তাঁর প্রবন্ধে কোন ভুল তথ্য থাকে তবে তাঁকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করবেন যাতে পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি তা শুদ্ধ করার সুযোগ পান। আরো উল্লেখ করছি যে, আব্দুল ওয়াহাব মহাশয়ের প্রতি রইলো অন্তর ও বুক ভরা ভালোবাসা আদর ও স্নেহ। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করছি।

৬ ই নভেম্বর, ২০০৩

মনসুর রহমান
প্রাক্তন সভাপতি
হরিশ্চন্দ্রপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতি, মালদহ

মাননীয়,
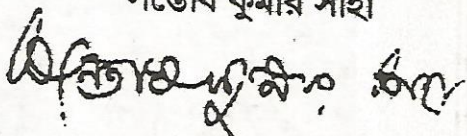
আবদুল ওয়াহাব সাহেব,

প্রধান শিক্ষক, সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্র, মালদহ।

মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্রের সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওয়াহাব সাহেবের লেখা 'একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর' এবং 'যুগে যুগে মহান পুরুষদের বাণী ও নীতি সম্ভার' পড়ে খুশী হলাম।

'একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর' বইটা তথ্যবহুল এবং জেলার নবাগতাদের অনেক তথ্য জানাতে সাহায্য করবে। তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে আগামী দিনেও এধরনের বই প্রকাশিত হবে আশা করি এবং তিনি যে মালদা জেলার একজন বিশিষ্ট, সর্বোতকৃষ্ট এবং সেরা শিক্ষক তা তাঁর কাজের মাধ্যমেই প্রমাণিত। আমি তাঁর সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সন্তোষ কুমার সাহা

[signature]

তারিখ ঃ ০১/০৬/২০০৪

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
(প্রাঃ) ও সচিব মালদা জেলা প্রাথমিক
বিদ্যালয় সংসদ মালদা
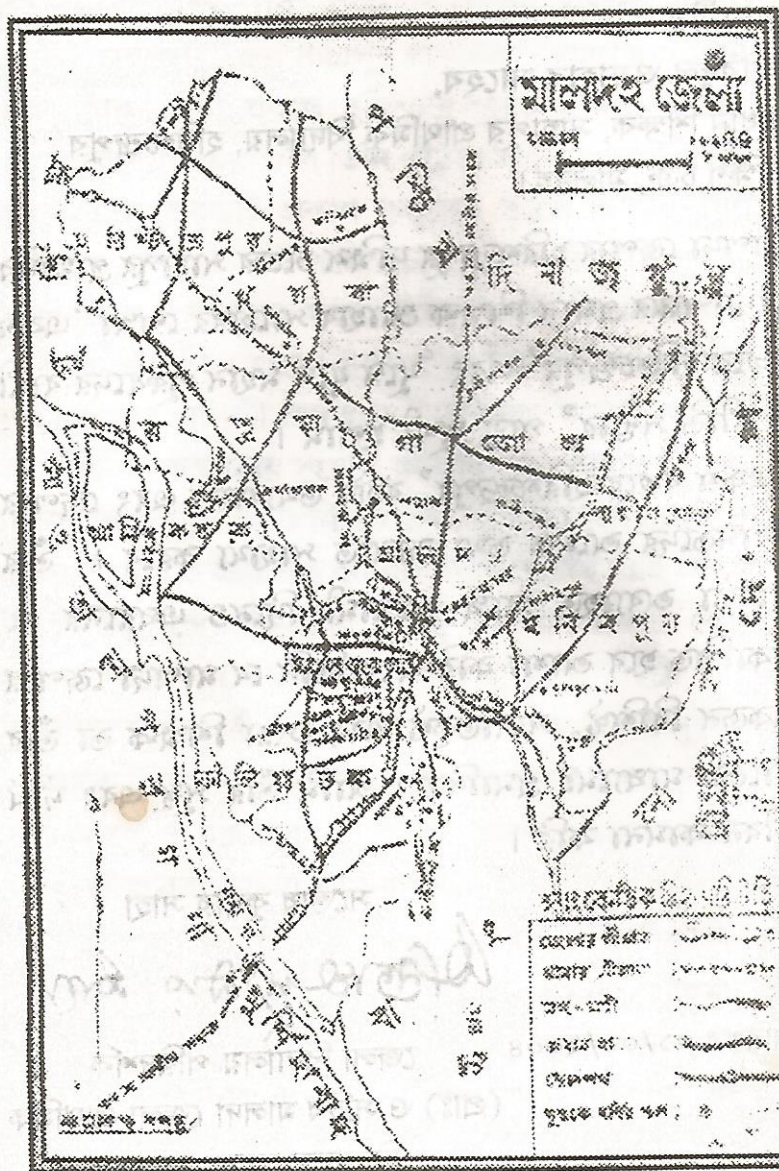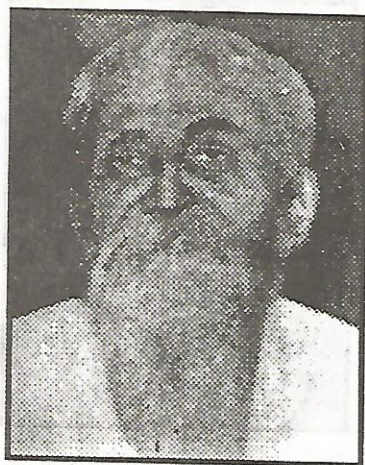
মালদহ জেলা

মহামোহ পাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী

সৌরেন্দ্র মোহন মিশ্র

রামহরি রায়
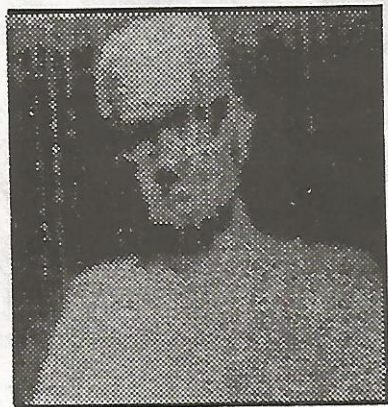
সুবোধ মিশ্র
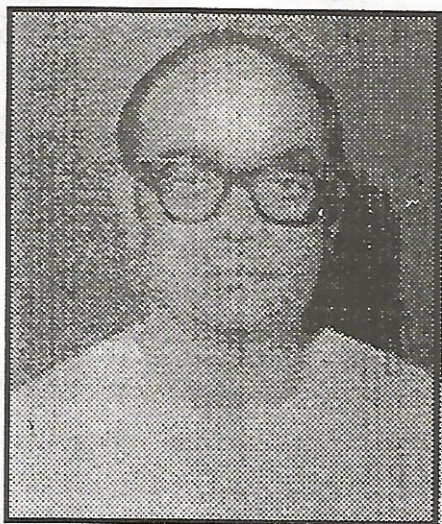
রামপ্রসন্ন রায়
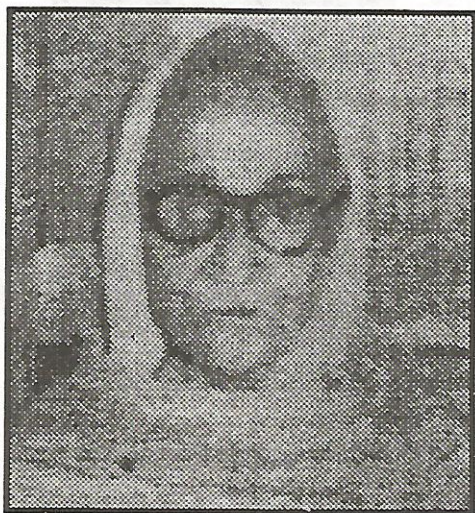
সুরেন্দ্রবালা রায়

আব্দুল বাসেদ মিঞা

বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র

স্বাধীনতা সংগ্রামী পরমেশচন্দ্র রায়

মালদহ জেলা পঞ্চাদশ বই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৭ই জানুয়ারী, ২০০৪ মালদহ কলেজ ময়দানে শিবরাম চক্রচর্তী মঞ্চে উদ্বোধক মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রীনিমাই মাল মহাশয় "১০০ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর" বইটি প্রকাশ করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে লেখক আবদুল ওয়াহাব সাহেব। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ মন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার, সাংসদ শ্রী এ.বি.এ.গণিখান চৌধুরী, সভাধিপতি শ্রী গৌতম চক্রবর্তী, জেলা শাসক শ্রী অশোক বালা, শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক সন্তোষ চক্রবর্তী প্রমুখ।

“একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর” লিখতে গিয়ে প্রথমেই হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদার বংশের একটা মোটামুটি তথ্য দিবার চেষ্টা করছি। হরিশ্চন্দ্রপুরের এই জমিদার বংশের দানে স্কুল, হাসপাতাল এবং প্রথম ডায়নামো দ্বারা পরিচালিত বিজলী উৎপাদনগৃহ এবং নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দানের কথা চির স্মরণীয়। তেমনি মূলতঃ এঁদেরই উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুরের মত তৎকালীন গণ্ডগ্রামে এঁদেরই জমিতে ও অর্থে একটি নাট্যমঞ্চ ও এদেরই দানে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়। মহড়া এবং অভিনয় বৃহদাংশে নিয়মিত চলতে থাকে এবং পিছনের অংশে সুবৃহৎ পাঠাগার চালু হয়। এবং ঐ পাঠাগার পরবর্ত্তীতে ১৯৭৪ সালে নতুনভাবে স্থানান্তরিত হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর টাউন লাইব্রেরী হিসেবে মর্যাদা পায় এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের সুসন্তান রাষ্ট্রপতি সম্মান প্রাপ্ত দেশিকোত্তম “বিধুশেখর শাস্ত্রী পুর গ্রন্থাগার” নামে চালু হওয়ার পর এ গ্রামের আপামর জনগণ সকলেরই প্রভূত উপকার হয়েছে। বর্ত্তমানে ভালো অনুদান পাওয়ায় গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ বলা যায়। ১৯৩৫ সালে হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি হাই স্কুল স্থাপন করার মূলে থানার বহু শুভাকাঙ্খীর দান আছে কিন্তু মূলতঃ উদ্যোগী এই জমিদারকুল। কারণ প্রতাপশালী জমিদার ঁভজমোহন রায়ের পুত্র ঁরামকিঙ্কর রায়ের উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত একটি স্কুল এই বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরে হাইস্কুল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অবলুপ্ত হয়। একদিকে

বিরাট কাছারী ঘর, মালখানা, তোষাখানা, বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ, দোল দূর্গোৎসব জমিদার এবং প্রজার নিবিড় বন্ধন অপর দিকে স্বগৃহে এ বিদ্যালয় বাড়ীর সংস্কৃতি ব্রিটিশ যুগে একটা আদর্শ ছিল। পরবর্ত্তী বংশধরেরা এ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে দান, ধ্যানের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নে সবরকম সাহায্য এবং তদারকি করায় আমার এ প্রবন্ধ সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এবংশেরই কূল গৌরব ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায় বিনামূল্যে প্রায় দুই লক্ষ লোকের চক্ষু অপারেশন করে এলাকার প্রভূত উপকার করেছেন। এঁদেরই উদ্যোগে ১৯৬৮ সালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একমাত্র ও অন্যতম গৌরব "কিরণবালা" বালিকা বিদ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশেরই অন্যতম সুসন্তান ঁরামপ্রসন্ন রায় এম.পি-র ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা এবং মূল্যবান জমিদান করে হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো এবং পানীয় জলকলের সুযোগ এনে দেন।

১৯৫০ সালের ৯ই জানুয়ারী তৎকালীন আই.সি.এস. অফিসার শ্রী জে.এন.তালুকদার কর্তৃক উন্মোচিত রাজ রাজেশ্বরী চিকিৎসালয় বর্ত্তমানে পি.এচ.সি থেকে এইচ.এস.সি তে রূপান্তরিত হয়ে ১০০ বেডের রুগী ভর্তির মত ব্যবস্থা এ চিকিৎসালয় হয়েছে। এটাই প্রকারান্তরে এই জমিদার বংশেরই অবদান যা অত্র হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার জনগণের অশেষ উপকার করছে। বাংলা সাল মোতাবেক ১৩৩৯ সনে জমিদারদের দানে হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি

জনহিতকর প্রতিষ্ঠান "হরিশ্চন্দ্রপুর সংগঠন সমিতি" স্থাপিত হয়। যার ফলে উক্ত সংগঠন সমিতির গৃহে বিভিন্ন রকম নাচ, গান, রাজনৈতিক থেকে সামাজিক বহু আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়োজনে দুঃস্থ রোগীদের আত্মীয় স্বজনের থাকার ব্যবস্থাও এখানে থাকে। যাক্ এখন আমি এই জমিদার কুল থেকে বেরিয়ে আসা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথায় আসি।

একদিকে উন্নয়ন অপর দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে জমিদারদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ঁসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র- আর একদিক থেকে এলেন গরিয়ান ও বরিয়ান পুত্র ঁরমাপ্রসন্ন রায়। এদেরই সাথে যোগ দিলেন তাদেরই আত্মীয় ঁপরমেশ চন্দ্র রায় ও শ্রী কানাই রায়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম পিপলার ঁসুবোধ কুমার মিশ্র ও ঁবিভূতিভূষণ মিশ্রের নেতৃত্বে শুরু হল স্বাধীনতা আন্দোলন। কালাতরফের ঁশচীন্দ্র নাথ মিশ্র যুক্ত হলেন। যোগ দিলেন বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন জীবিকার বেশ কিছু সৈনিক। বানর সেনা হিসেবে ছাত্রদল দলে দলে যোগ দিয়ে দলটাকে সমৃদ্ধ করল। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' তখন পণ হয়েছিল সর্বস্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামীর আচারে ও আচরণে। শুরু হল জোরদার আন্দোলন। গান্ধীজী ডাক দিলেন "করেঙ্গ ইয়ে মরেঙ্গে" এবং ইংরেজ "ভারত ছোড়"। Quit India। ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট হরিশ্চন্দ্রপুর থানা, পোঃ অফিস, রেল স্টেশন, রেললাইন টেলিগ্রাফের যোগাযোগ সব তছনছ হয়ে গেল।

থানায় উড়ানো হল "পতাকা"।

১০ই, আগষ্ট ১৯৪২ থমথমে আবহাওয়া। ১১ই আগষ্ট ১৯৪২ লাল পাগড়ীর পুলিশে হরিশ্চন্দ্রপুর ভরে গেল। ডাক পড়ল সকলের। একে একে গ্রেপ্তার হয়ে চালান হলেন ক্ষীর ও ননী খাওয়া সন্তানেরা। কারান্তরালে চলে গেলেন। সূদীর্ঘ ৫ বছর কেটে গেল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। ১৯৪৭ এ অন্তবর্ত্তী সরকারে স্বাধীন ভারতের একখন্ডে প্রধানমন্ত্রী হলেন ঁজওহরলাল নেহেরু ও রাষ্ট্রপতি হলেন ঁরাজেন্দ্রপ্রসাদ। ইংরেজদের চালের ফলে খন্ডিত ভারতের অপরাংশের কর্ণধার হলেন কায়েদে আজম মহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ সাহেব। মালদহ জেলা ১৫ ই আগষ্ট স্বাধীন হলনা। র‍্যাড ক্লিফের রায়ে মালদা জেলা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবে এরকম আশংকা দেখা দিল। অনেক আলাপ আলোচনার পর র‍্যাড ক্লিফ রোয়েদাদের হস্তক্ষেপে পাঁচটা থানা বাদ দিয়ে সমস্ত মালদা জেলা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে রাখা হলো। কাজেই হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৭, স্বাধীন ভারতের ঝান্ডা তুলল।

কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, শিরোপা নিয়ে সংগ্রামী নেতাগণ। হরিশ্চন্দ্রপুর বাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ঐ সঙ্গে মালদহের সুসন্তান হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রবাসী ঁরামহরি রায়, ঁউমা রায়, ঁতরুবালা সেন এবং শহরের

শান্তি সেন এবং আরো কয়েকজনও মুক্তি পেলেন। উল্লেখ করা ভালো ডাহুয়া গ্রামের ঁকৃষ্টধর মন্ডল, ভালুকা বাজারের ঁবানওয়ারী কর্মকার, পরমানন্দ ওঝা প্রভৃতি আরো অনেকেই তাঁদের সাথে মুক্তি পেলেন।

শ্রী প্রবোধ মিশ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করা হল—১৯৪২ এর হরিশ্চন্দ্রপুরের আগষ্ট আন্দোলনে মঙ্গলবার হাটে পিকেটিং করা হয়। রাত্রে পোষ্টার লাগানো হয়। বৃহস্পতিবার বারদুয়ারীহাটে কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা হয়। ঁসুবোধ মিশ্রের খোঁজে শুক্রবার সকালে পুলিশ তাঁর বাড়ীতে যায়। কিন্তু বারদুয়ারী থেকে ফেরার পথে সুবোধবাবুকে দারোগা—হরিশ্চন্দ্রপুরে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সঙ্গে করে বাড়ীতে যাতায়াতের জন্যে অনুমতি দেন। সুবোধ প্রথমে আমাকে বলেন যে, এখনই আমাকে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পাগলা ঘন্টা বাজানো হয়। পিপলা কাশিমপুরের বহু লোক এসে যায়। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সমিতির কাছে সকলে জমা হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের পথ দিয়ে রামরায়ের পথে থানার দিকে শোভাযাত্রা চলে। অনেক লোক হয়ে যায়। বড় তরফের কাছে এলে ঁরমা প্রসন্ন রায় জানতে পারেন যে সুবোধ বাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রমাপ্রসন্ন এসে শোভাযাত্রায় যোগ দেন। রমাপ্রসন্ন সে সময় হরিশ্চন্দ্রপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন। সুবোধবাবু ছিলেন সভাপতি। হঠাৎ রমা রায় চিৎকার করে

বলে উঠলেন—"সুবোধ বাবুকে নিয়ে গেলে আমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে হবে।" —সেই সময় রামকিংকর বাবু তাঁর ছেলে রাধিকা প্রসন্নকে নিয়ে "মিহা হাটে" চলে যান যাতে সে আন্দোলনে না যোগদান করতে পারেন এই উদ্দেশ্যে। শোভাযাত্রা থানার কাছে এলে পুলিশ দুজন থানার ও সি কে বলেন "সাহেব, সুবোধ আপকা জিম্মামে"। সেই সময় সুবোধ বাবু সামান্য কিছু ভাষণ দেন, এবং তারপর শোভাযাত্রা স্টেশনের দিকে চলতে থাকে। তখন বন্যার সময় নৌকা ছাড়া চলাচল সম্ভব ছিল না। ট্রেণ আগেই বন্ধ হয়ে যায়। প্রশেসন স্টেশনে এলে জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২০০০ হাজারের মত। ও.সি. সুবোধ বাবুকে জনতার হাত থেকে নিয়ে মালদায় চালান দিতে আপারগ হওয়ায় বনবাসে সার্কেল অফিসের কাছে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন "কি করবো? সার্কেল অফিসার ছেড়ে দেবার কথা বলেন। ফেরার পথে জনতা উল্লসিত হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন পথে পোষ্ট অফিস পর্যন্ত সব টেলিফোনের পোস্ট ভেঙে ফেলেন। এরপর জনতা থানা আক্রমন করতে যায়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন এই থানাকে নিজেদের জিম্মাদার বলে জানান এবং পরের দিন এই থানাতে পতাকা উত্তোলন করবেন বলেও ঘোষণা করেন।—এই ভাবেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, কিছু সদস্য রাত্রে ইউনিয়ণ বোর্ড অফিস তছনছ করে। থানা অবশ্য অক্ষত থাকে। এরপর রবিবার ৮/১০ জন ভলেন্টিয়ার

তুলশীহাটা হাটে গিয়ে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার পর ফেরার পথে সন্ধ্যেবেলা জানতে পারিযে—মালদা থেকে কোনও অফিসার ডাক বাংলাতে এসেছেন। সেই রাত্রেই সুবোধ বাবুকে গ্রাম থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। পর দিন সোমবার আমরা 'মিহা হাটে' গিয়ে ধান চালানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মনস্থ করি। উদ্দেশ্য ছিল রাধিকা প্রসন্ন যাতে আমাদের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। সকাল বেলা আমি বীর বীড়শার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার পথে থানার সামনে ও.সির সঙ্গে দেখা হয় এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন "মিহা হাটে যাচ্ছ নাকি?" উত্তরে বলি "গেলে জানিয়ে যাবো," সেই সময় দেখি কয়েকজন 'ইনফরমার" থানা এবং পুরাতন পোষ্ট অফিসে যাতায়াত করেন। আমি বীরশাকে না পেয়ে মণ্ডলের খোঁজে যাই। তাঁদের কাউকে না পেয়ে কেষ্ট মণ্ডলের খোঁজে যাই। তাদের কাউকে না পেয়ে আবার থানার দিকে ফিরে আসি জরুরী চিঠি পোষ্ট করার জন্য। তখন চিঠিপত্র থানার মাধ্যমেই আসতো যেতো। সেই সময় আবার ও.সির সঙ্গে দেখা হয়। ও.সি. বলেন যে—'ইউ আর আন্ডার অ্যারেষ্ট।" আমাকে থানায় যেতে হয়, এবং আমার খাবার ব্যবস্থা এক আত্মীয়ের বাড়ীতে হয়। ও.সি. বলেন যে অনেককে ডেকে পাঠিয়েছি কিন্তু কেউ আসেনি। কিছুক্ষণ পর ব্রজেন আচার্যও বিভূতিভুষণ চক্রবর্তী থানায় হাজির হয়। আমাদের

তিনজনকে মালদা পাঠানোর জন্য কাগজপত্র তৈরী করার পর বেলা ১.৩০ নাগাদ ট্রেনের বাঁশী শোনা যায়। তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় প্রায় দুশজন গোরা সোলজার প্রায় একশ জন বন্দুকধারী পুলিশ আসে। থানার হাটে মেশিনগান, টমিগান ফিট করতে আরম্ভ করে, এবং আমাদের তিনজনকে লক্ আপে পুরে দেয়। তাঁদের ধারণা ছিল এখানে একটা খণ্ড যুদ্ধ হবে। কারণ সেই সময় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে প্রায় ৩২ টি বন্দুক ছিল। তাঁরা প্রথমে সেগুলোকে সিজ্ করে। ২জন অফিসার পিপ্‌লা ও হরিশ্চন্দ্রপুরে ছুটোছুটি করে, প্রায় ২৫ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা যখন বুঝতে পারলো যে, খণ্ড যুদ্ধের ঘটনা শুধু প্রচার মাত্রই তখন তারা ওখান থেকে চলে গেল। পিপ্‌লা গ্রাম থেকে বীরেণ চক্রবর্ত্তী, বিমলাচরণ চক্রবর্ত্তী, জটিলেশ্বর চক্রবর্ত্তী, সুশীল রায়, পঙ্কজ মৈত্র, দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মী চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী ও রামভুষণ দাসকে নিয়ে আসে। হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় যাঁদের, তাঁরা হলেন পরমেশ রায়, কমলা রায়, ভুট্টা, বিষ্ণু, জগদীন্দ্র মিশ্র, রমাপ্রসন্ন রায়, কানাই রায়, সুশীল ভট্টাচার্য, রুক্‌কীনি মিশ্র, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, রামলক্ষ্মণ পাশমান ও বীরবীড়শা। গ্রাম থেকে ধরা হয় দুজনকে। এর পর এঁদের সকলে রাত্রে ডাক বাংলায় রেখে সকালে ট্রেনে পুলিশ পাহারায় মালদা চালান করা হয়। সকলের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে সুবোধ মিশ্র নৌকা করে মালদায় গিয়ে ডি.এম-

এর কাছে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই উদ্ধৃতি হলো ব্যক্তিগতভাবে শ্রী প্রবোধ মিশ্রের।"

স্বাধীনতা আন্দোলনের এ হল মোটামুটি রেখাপাত। স্বাধীনোত্তর যুগে হরিশ্চন্দ্রপুরের রাস্তাঘাট, বিজলীবাতি, হাসপাতাল, ব্লক অফিস বি.এল.এন্ড এল আরও অফিস তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চক্র অফিস, হাইস্কুল গার্লস স্কুল, ভজমোহন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৩ সালে একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। আমার এ হরিশ্চন্দ্রপুরের একশ বছরের ইতিহাস প্রবন্ধে। সে ঘটনা হল ১৯০৩ সালে মালদহ-কাটিহার রেললাইন হবে। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর, অখ্যাত, অবজ্ঞাত থেকে যেত যদি না প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ঁরামকিঙ্কর রায় বেঁকে না বসতেন ভালুকা রেল স্টেশন থেকে সোজা কাটিহার রেল লাইন গেলে রেলেরই লাভ হত, হরিশ্চন্দ্রপুরের কোন লাভ হত না। লাট সাহেবদের পাখীর শিকার করতে এনে, খানা পিনা দিয়ে মন জয় করে হরিশ্চন্দ্রপুরের ১ কিলোমিটারের মধ্য দিয়ে রেল লাইন টেনে আনা হল এবং ধনুকের মত ব্যাঁকা হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর হয়ে সোজা কুমেদপুর-কাটিহার লাইনটি চলে গেল। এ রেল লাইনের তদানীন্তনকালে নাম ছিল ই.বি.আর (Eastern Bengal Railway)। এই হরিশ্চন্দ্রপুরের লোক কলকাতা যেতেন ঈশ্বরদি-পার্বতীপুর-আমনুরা হয়ে, গোদাগাড়ী-লালগোলা হয়ে, কাটিহার-মণিহারী

ঘাট-সাহেবগঞ্জ হয়ে। কেউ কেউ নৌকোর সুযোগে রাজমহল, তিনপাহাড় হয়ে কলকাতা যেতেন।

ফারাক্কা ব্রীজ হওয়ার পর এবং পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) আর পার্ব্বতীপুর হয়ে কলকাতা যেতে হয় না। ফারাক্কা ব্রীজ উত্তরবঙ্গ হতে দক্ষিণবঙ্গে বিশেষতঃ কলকাতার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। এবার আসি অন্য প্রসঙ্গে চাঁচলের জমিদার 'রাজা' খেতাব পেয়েছিলেন। রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর একমাত্র পুত্র পিতার সহিত মতানৈক্যে আত্মহত্যা করেন।

রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী চাঁচল থেকে সামসী রাস্তা নির্মাণ করলেন, রাস্তার পাশে সুশোভিত করলেন বিশাল বিশাল গাছের চারা বপন করে — স্বচেষ্টায় সুড়কী বিছালেন, রেলের ইঞ্জিন কিনে আনলেন, রেল লাইন দিয়ে সামসী চাঁচলকে যুক্ত করার ইচ্ছা। কিন্তু ভগবান বাধ সাধলেন। রাবণের সিঁড়ি বাঁধা হল না। মালদহ শহরে নলবাহিত জলের ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। মালদহবাসী জল পেলেন।

এই দানবীরের রাজবাড়ীটি অনাদরে অবহেলায় আজ শেষ হয়ে যেতে বসেছে। সরকার এই 'হেরীটেজের' কোন মূল্য দেয়না, জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ হল, সরকারী নির্দেশে ট্রেনিং কলেজ উঠে গেল। উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়ীটিতে ১৯৬৯ সালে কলেজ হল। হরিশ্চন্দ্রপুরের কৃতী সন্তান তৎকালীন

মন্ত্রী শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় মহকুমা
হল। মালদার একমাত্র মহকুমা। তবে কোন লাভ হলনা।
বাড়ীটি নেওয়া হলনা। প্রসঙ্গত বলতে হচ্ছে এজন্য
ভালুকাবাজারে সুবিশাল জমিদারবাড়ী সহ, ঠাকুর দালান
যখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেল তখন হরিশ্চন্দ্রপুরের যে
জমিদার বাড়ী হল এখন তা সরকারী অফিস। ভালুকার
জমিদারের এক শরীকের হরিশ্চন্দ্রপুরের বাড়ীতে এখন
সরকারী অফিস। হরিশ্চন্দ্রপুরের অন্যতম জমিদারবংশ
যাঁদের দানে হরিশ্চন্দ্রপুরের সব অফিস, হাসপাতাল, শিক্ষা
প্রতিষ্ঠান হয়েছে তাঁদের বাড়ীর একটি অংশে সরকারী
অফিসারেরা থাকেন। অপরাংশে তাঁদের সন্তান সন্ততি একই
ছাদের নীচে দোলে, দূর্গোৎসবে একত্র হন। সেজন্য বিলুপ্ত
জমিদারীর ধারা বজায় রেখে বাড়ী-ঘর সুরক্ষিত আছে। নচেৎ
চাঁচলের রাজবাড়ীর দশাই হত। যেমন গৌড়ের আজ ভগ্নপ্রায়
অবস্থা। সরকারের সযত্ন দেখাশুনা বা মেরামতির টাকার
দেখা নেই। ফলে ইট চুরি হয়ে যাচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের আর
একটি উল্লেখযোগ্য ও বর্ধিষ্ণু পরিবার হল ভট্টাচার্য্যি পরিবার
যা 'কালীবাড়ী' নামে সকলে জানেন। সেখানে পঞ্চমুন্ড বলী
দিয়ে আসনে তিনরূপে কালিমাতা পূজিত হয়ে আসছেন
সে পরিবারেই জন্ম নিয়েছিলেন তৎকালীন বৃটিশ যুগের
ইঞ্জিনীয়ার হরিশ্চন্দ্রপুরের ইন্দুশেখর ভট্টাচার্য্য তাঁর পুত্র এবং
পৌত্র ডাক্তার। এঁরই জ্ঞাতিভ্রাতা পন্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য

(শাস্ত্রী) হরিশ্চন্দ্রপুরের কূল গৌরব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের খুব কাছের লোক। তদানীন্তনকালে শান্তিনিকেতনের সুপন্ডিত, অধ্যাপক, আড়ম্বরহীন, দেশিকোত্তম উপাধীপ্রাপ্ত মহাপুরুষ যার কথা মোটেই ভুলার নয় এবং ইঁনার কথা পূর্বেই আমার প্রবন্ধে জায়গা পেয়েছে।

ইঁনার শরিকের অন্যান্য বংশধররা যদিও অনেকে প্রয়াত হয়েছেন কিন্তু যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই কৃতী সন্তান। এবার আবার রেল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। হরিশ্চন্দ্রপুরের রেল স্টেশন ছিল বারসই। বারসই সমেত পূর্ণিয়া জেলা ছিল অবিভক্ত বাংলার এবং নবাব সিরাজ দৌল্লার আমলে শাসিত অংশ। সেজন্য নবাব সিরাজ পূর্ণিয়া জেলার এই অংশটা একজন সুবেদারের অধীনে রেখেছিলেন। সে সময় তুলসীহাটায় ছিল থানা। পরবর্ত্তীতে ১৮৯৬ সালে ২১শে সেপ্টেম্বর হরিশ্চন্দ্রপুরে থানা স্থানান্তরিত হয়ে আসে যা বর্ত্তমান থানা আধিকারীক সূত্রে জানা সম্ভব হয়েছে। রেললাইন চালু হওয়ার জন্যেই তুলসীহাটা থেকে থানা স্থানান্তরিত হয়েছে। এবং ডাক যাতায়াতের সুবিধার জন্য তুলসীহাটা থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরে ডাকঘর চলে আসে। তুলসীহাটা একটি শাখা ডাকঘর হিসেবে থেকে যায়। পরবর্ত্তীতে অনেক চেষ্টায় সেই ডাকঘরকে উন্নত করা হয়। এ প্রসঙ্গে আবার আসা যাবে।

গ্রাম না শহর? হরিশ্চন্দ্রপুর জমিদারের জায়গা। জমিদারের জমিগুলি জমিদারী যাওয়ার আগেই গ্রাম থেকে শহর করার জন্য জমিদারের ঘর থেকে জমি দান শুরু হয়েছিল যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

জমিগুলিতে গড়ে উঠল বিভিন্ন ইমারত স্কুল, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক আর কত কী সরকারী অফিস। একে একে ইমারত, অফিস বাড়তেই লাগল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যেখানে মাত্র ৭টি প্রাঃ স্কুল ছিল এবং মাত্র কয়েকটা হাই স্কুল। বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মোট ৩টি বিদ্যালয় পরিদর্শকের তিনটি চক্র স্থাপিত হয়েছে এবং তিনটি চক্রের মোট প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ২১৪ টি। সম্প্রতি বিদ্যালয় পরিদর্শকের ৪টি অফিস হতে চলেছে। হরিশ্চন্দ্রপুর দঃ চক্র বিভাজন হয়ে কড়িয়ালী চক্রনামে আর একটি চক্র গঠিত হতে চলেছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা ও রতুয়া মিলে ছিল একটি চক্র অফিস। এবং ছিলেন মাত্র একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হত সামশীতে। এখন হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় ৩টি চক্র অফিস। মাধ্যমিকের পরীক্ষা হয় ৫টি স্কুলে। হয়েছে অনেক হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত উন্নতি হলেও বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি কলেজের দরকার মিটল না। কলেজ নেই। তাই অত্র থানার ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে কষ্টসাধ্য হলেও চাঁচল

ও সামশী কিম্বা মালদহ কলেজে পড়তে যাবার দরকার হয় রোজদিন। এবারে হরিশ্চন্দ্রপুরের ৩টি চক্রের অধীনে প্রাইমারী স্কুল ও হাই, জুনিয়র হাই স্কুল, হাই ও জুনিয়র হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়ার মাদ্রাসার পরিসংখ্যান সহ নাম নিম্নে প্রদান করলাম।

হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্র প্রাঃ স্কুল ১০৯টি হাই, জুনিয়র হাই স্কুল ও মাদ্রাসা মোট ২৪টি মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্র। যথাক্রমে —

১) মিটনা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।

২) দৌলতপুর হাই স্কুল।

৩) মশালদহ গণপত রায় মোদী হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।

৪) হরদমনগর হাই স্কুল।

৫) দৌলত নগর হাই স্কুল।

৬) সাদলীচক হাই স্কুল।

৭) সুলতাননগর হাসনিয়া হাই স্কুল।

৮) বারদুয়ারী হাই স্কুল।

৯) ভাকুরিয়া জুনিয়র হাই স্কুল।

১০) ভুনা আদিবাসী জুনিয়র হাইস্কুল।

১১) বেজপুরা জুনিয়র হাই স্কুল।

১২) তেলজান্না জনকল্যাণ জুনিয়র হাইস্কুল।

১৩) মিলনগড় হাই মাদ্রাসা।

১৪) মিটনা হাই মাদ্রাসা।

১৫) টালবাংরুয়া হাই মাদ্রাসা।

১৬) চিথোলিয়া হাই মাদ্রাসা।

১৭) জগন্নাথপুর জুনিয়র হাই মাদ্রাসা।

১৮) সোনাকোল জুনিয়র হাই মাদ্রাসা।

১৯) ধনিপাড়া আজিজিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসা।

২০) ইসলামপুর সাগরিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসা।

২১) মিটনা সিনিয়র মাদ্রাসা।

২২) তালগাছি সিনিয়র মাদ্রাসা।

২৩) মিলনগড় সিনিয়র মাদ্রাসা।

২৪) টালবাংরুয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

এবার আসি হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং চক্রের প্রাইমারী ও মাধ্যমিক

স্কুলের পরিসংখ্যানে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং চক্রে প্রাইমারী স্কুলের মোট সংখ্যা ৪০ টি।

হাই স্কুল, হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, জুনিয়র হাই স্কুল, হাই মাদ্রাসা ও জুনিয়র হাই মাদ্রাসা মিলে মোট ৭টি।

যথাক্রমে- ১) হরিশ্চন্দ্রপুর হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।

২) পিপলা হাই স্কুল।

৩) মহেন্দ্রপুর হাই স্কুল।

৪) ভিঙ্গোল — হাই স্কুল।

৫) কিরনবালা বালিকা বিদ্যাশ্রম।

৬) কনুয়া জুনিয়র হাই স্কুল।

৭) কনুয়া হায়ার সেকেন্ডারী মাদ্রাসা।

এবারে তুলসীহাটা চক্রের প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসার পরিসংখ্যান। তুলসীহাটা চক্রে মোট প্রাইমারী স্কুল ৬৫টি, হায়ার সেকেন্ডারী, হাই, জুনিয়র হাই স্কুল ও জুনিয়র হাই মাদ্রাসা মোট ৮ টি মাধ্যমিক শিক্ষার স্তম্ভ ঃ-

যথাক্রমে ঃ- ১) তুলসীহাটা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।

২) মাখনাকুইল পাড়া হাই স্কুল।

৩) চন্ডীপুর হাই স্কুল।

৪) বিষ্ণুপুর হাই স্কুল।

৫) কুশিধা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল।

৬) বরোই পদ্মমনি হাই স্কুল।

৭) ভাটোল জুনিয়র হাই স্কুল।

৮) পেমা ভক্তিপুর হাই মাদ্রাসা।

ইহা ছাড়া হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় দুটি ব্লকের অধীন মোট ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস এবং ভোটারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২টি নির্বাচন কেন্দ্র হওয়ার কথা। প্রশাসনিক ক্ষেত্রের সুবিধার্থে ২টি বিধায়কের ক্ষেত্রে ১টি বিধায়কের এলাকাই হয়ে আছে। জনসংখ্যার অনুপাতে কম হলেও ২টি হাসপাতাল, ৭টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, আর ৭টি পশু হাসপাতাল রয়েছে। বিজলীর গ্রাহক সংখ্যা অনেক। চাহিদা মোতাবেক বিজলী দপ্তর বিজলী সংযোগ করতে পারছেনা। জংশন বাদে রেলের সব সুযোগ সুবিধা হরিশ্চন্দ্রপুরে। হাটবাজার, বড় ব্যবসায়ী, বড় ডিলার, এম.আর.রেশন গ্রহিতার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে।

চারিদিকে রাস্তা যা হয়নি তা হওয়ার পথে। পরবর্ত্তীতে যে গ্রামগুলোর কথা বলব তার সঙ্গে যুক্ত। সব রকম যানবাহনের প্রতিযোগীতা বেড়েই চলেছে।

মানুষকে জীবনের গতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য নাগরিক সুখ সুবিধার কোন অভাব নেই। তবু চাহিদার শেষ নেই। নেই মিল বা কলকারখানা। শিল্পোদ্যোগ নেই। দেশবিভাগের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত উদ্বাস্তুর স্রোত। এটা নেই বলেই হরিশ্চন্দ্রপুর হল মালদহের কসবা। কাজেই শান্তিপ্রিয় সমৃদ্ধ গ্রাম শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাভ কী?

থানার উত্তরের শেষ প্রান্তে কুশিধা অত্যন্ত অবহেলিত ও উপেক্ষিত ছিল। হাই রোড দিয়ে যুক্ত করা হল। প্রথমে "কু" হলেও এখন হাসপাতাল হয়েছে। ব্যাঙ্ক, গোলা হয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক রাতের মধ্যে বিরাট হাট বসেছে। বিহার সংলগ্ন হওয়ায় ব্যবসায়ীদের অনেক সুবিধা। কুশিধা থেকে বারসই যাবার রাস্তা ৩৪ নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত।

শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, ডালখোলা, কিষণগঞ্জ খুব কম সময়ে যাওয়া যায়। একটু বিহার সরকার নজর দিলে বিকল্প বাংলা-বিহার রাস্তা পায় জনগণ। কুশিধার সরকার বাড়ীতে প্রাচীন কেউ নেই। তবু আছে ২০১ বছরের দুর্গাপূজা। কুশিধা বরুই থেকে মরা মহানন্দার তীরে বরুই এবং গোহিলা দুটো পাশাপাশি গ্রাম। পাকা রাস্তার সঙ্গে যুক্ত। হাসপাতাল আছে। আর আছে গঙ্গাতলার মেলা। পাশেই স্বরুপগঞ্জ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সীমানা এবং চাঁচল সংযোগ কারী রাস্তা টারমিনাল।

এই রাস্তার ধারে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম মকদুমপুর পার হয়ে চাঁচল। চাঁচল সংযোগ করছে মানিকচক, গাজোল, আশাপুর, স্বরূপগঞ্জ, হরিশ্চন্দ্রপুর। মালদহ, কলকাতা, শিলিগুড়ী, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ বা তারো আগে যাওয়ার যোগাযোগ সহজসাধ্য। রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী চাঁচল রাজবাড়ী নির্মাণ করে গেলেন। দানধ্যান করলেন। ছেলের মৃত্যুর পর সব খাপছাড়া হয়ে গেল। সব রকম অফিস ছিলই বহু চেষ্টার পর মালদহের একমাত্র মহকুমা চাঁচলে স্থাপিত হল। একথা আগেও বলেছি হাসপাতালটাও মহকুমা হাসপাতাল হল। কিন্তু জটিল রোগী হলেই মালদহ। আর বিচার, আচার ট্রেজারী সবই এখন মালদহে। কাজেই মহকুমার আস্বাদ জেলার উত্তরাংশ এখনো পেলনা। কবে পাবে জানিনা। আর্থিক অনটনের কৈফিয়ত ও সরকারী উদাসীনতার মায়াজালের বন্ধন থেকে মুক্তি হবে কবে?

বিহারে একটা কহাওত আছে — এই বেহাল রাস্তা মেরামত হবে কবে? উত্তর M.L.A. বদল হবে যবে। চাঁচল উত্তর মালদার রাজধানীর চলছে এই হাল। চাঁচলে টেলিফোনের কর্তা বসে আছেন। সুদৃশ্য অফিস কাম কোয়ার্টার কিন্তু দুরালাপের রোগ, গ্রাহকের দুর্ভোগ থেকেই যায়। হতাশা এখনও জাগরূক। চাঁচলের পরেই সংলগ্ন গ্রাম পাহাড়পুর নেহাতি গ্রাম। কিন্তু আছে দ্বিতল চন্ডীমণ্ডপ যেখানে শতাধিক বলী হতো। আর আছে হাসির রাজা প্রয়াত শিবরাম চক্রবর্তীর

জন্মস্থল। সম্প্রতি চালু হল দমকল। যে কলের দম বেশিক্ষণ টিকেনা। এরপর মালতীপুর বাজার। রাজার দানে প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতুর কালিমাতা আর প্রজাদের গড়া মন্দির যেখানে দুর দুরান্ত থেকে লোকে পূজা দিতে আসে প্রতিদিন এবং নিয়মিত পূজা এখনও হয়। তার পরেই সামসী মার্কেটিং এর সদর দপ্তর, বিরাট হাট, অনেকরকম মন্দির। বড়বড় ব্যবসায়ী মোকাম, রেল স্টেশন এবং একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রপুরের কাছাকাছি এখানে চাঁচলের আগেই ১৯৬৮ সালে একটি কলেজ হয়েছে। সামসীর দুই দিকে দুই রাস্তা এক রাস্তা মানিকচক হয়ে মালদহ। আর এক রাস্তা গাজোল হয়ে মালদহ। আগে গাজোলের কথায় আসি। গাজোল একটি উন্নত গ্রাম। শিক্ষায়, রাজনীতিতে, খেলায় দূর দূর জনসংযোগের একটা কেন্দ্রস্থল। ব্যবসা বাণিজ্য হয় মোটা অঙ্কে। নানা সুখ সুবিধা থাকলেও, সব রকম অফিস থেকেও গ্রাম্য পরিবেশটা এখনও বজায় আছে। গাজোল থেকে বালুরঘাট, শিলিগুড়ী, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মালদহ সর্বত্র যাওয়ার সর্বদা সবরকম যানবাহন পাওয়া যায়। এবং সারা বছর নানান অছিলায় এখানে উৎসব, মিছিল, মিটিং জনসভা এবং মানুষের যাতায়াত দিন রাত একই রকম। গাজোলের পর আলমপুর হয়ে আদিনায় আসতে হয়। আদিনার মৃগদাব এবং আদ্যনাথের মন্দির এবং আদিনা মসজিদ ইতিহাসে স্বাক্ষী। আদিনার সাঁওতাল বিদ্রোহ চির স্মরণীয়।

মসজিদ এবং রাজপ্রাসাদগুলি সংরক্ষিত। তার পরেই পাণ্ডুয়ার রাজা শশাঙ্ক, হুসেন শাহ, রামপাল কার কথা বলবো। পাণ্ডুয়া আর গৌড়ের ইতিহাস, কে না জানে। আমার সামান্য উল্লেখে কি বর্ণনা করা যায়? এর পাশে একলাখী। সম্প্রতি রেলের খাতায় নাম উঠেছে। কেননা একলাখী থেকে বালুরঘাটে কখনো রেলগাড়ী গেলে সেটা হবে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কাটিহার হয়ে রায়গঞ্জ এবং রাধিকাপুর বাংলাদেশের সীমান্ত যে রেলগাড়ী ব্রিটিশ যুগে ছিল তার পরে দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর দিনাজপুরে কেউ কখনো রেলের বাঁশী শোনেনি। এখানে বাঁহে সম্প্রদায় কখনো রেলগাড়ীতে চড়েনি। এই হল একলাখী। পাণ্ডুয়া থেকে নারায়ণপুরে আসলাম। বি.এস.এফের বিরাট ক্যাম্প। বর্ধিত মালদহের বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল উন্নতির এবং প্রগতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে যদি বিনিয়োগ সংযোগ এবং সরকার একে অপরের পরিপূরক হত। তাহলে এই নারায়ণপুর হবে মালদহের 'হাওড়া' এবং এর পরেই ইংরেজবাজার বা মালদহ। মেদিনীপুরের পরেই মালদহের রাজনৈতিক অবস্থিতি। নেতাজী এসেছেন, অনেক নেতা এসেছেন, অনেক মহাপুরুষ এসেছেন। কালিন্দ্রী ও মহানন্দা দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। ইংরেজবাজারে বানানো শহরটা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছে। দূরদর্শন কেন্দ্র হয়েছে। হয়েছে অনেক সংগ্রামের স্বাক্ষী। মালদহ এবং সংলগ্ন পুরাতন মালদহ বা

নিমাসরাই দিয়ে যে জলপথ তারই সংলগ্ন সিঙ্গাবাদ, মুচিয়া, মহানন্দার অপর পারে বাংলাদেশের পতাকা। ৫ টি থানা ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে চলে গেল। চাপাই নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, রাজসাহী যা মালদহেরই অঙ্গ ছিল সেই অঙ্গচ্ছেদ হল। উদ্বাস্তু স্রোত এপারে এল। পুনর্বাসন দেওয়া হল। শহরটাও বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে গেল। একদিকে নারায়ণপুর আর একদিকে মালিহা, অপরদিকে সাদুল্লাপুর হয়ে গৌড়ের কাছাকাছি বিস্তৃত হয়ে গেল। গৌড় পেরিয়ে মহদিপুর গিয়ে মালদহ শেষ হয়ে গেল। চেকপোষ্টে, চেক হতে শুরু হল। একই জেলায় নাগরিক, লোহার জাল দিয়ে জেলাটাকে ভাগ করে দেওয়া হল। পথে পড়বে, পিঁয়াজবাড়ী ডাকবাংলো, সাদুল্লাপুরের মহাশ্মশান, পিরানাপীরের মাজার আর রামকেলীর মেলা যা জ্যৈষ্ঠ্য সংক্রান্তিতে বহু যুগ থেকে হয়ে আসছে। এই রামকেলীতেই শুরু হল গৌড়, গৌড়বঙ্গ ও গৌড়ের ইতিহাস। গৌড়ের ভগ্নস্তুপ গৌড়ের রাজবাড়ী, গৌড়ের মাজার, মসজিদ মিনারের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু চৈতন্যের পদধূলি, রামকানুর মন্দির এবং ঐতিহাসিক নিমগাছ। গৌড়ের অনেক ইঁট চুরি হয়েছে। গৌড়ের দৃপ্ত ইতিহাস, গৌড়ের স্মৃতিসৌধ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যা আগেই বলেছি। কি কারণে হিন্দু মুসলমান রাজারা গৌড়কেই রাজধানী করতেন এর ব্যাখ্যা মেলেনা। এত সংক্ষেপে

গৌড়ের কথা পূরণ করা যায়না। তবে গৌড়ের রাজা রামপাল হরিশ্চন্দ্রপুর কুশিধার দেবগিরী নির্মাণ করে নিজের ফলক লাগিয়েছিলেন। সুদৃশ্য, সুবৃহৎ মন্দির সম্পূর্ণ কষ্টি পাথরে তৈরী করেছিলেন।

তিনি ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী এবং পূণ্যার্থীদের জন্য গুটিকতক কুঠুরী ও তৈরী করেছিলেন। তাছাড়া গৌড়ীয় ইঁটে তৈরী হরিশ্চন্দ্রপুরের শিবমন্দিরে বর্তমানে অনেক পূণ্যার্থীর সমাগম হয়। ইংরেজ আমলে হরিশ্চন্দ্রপুরের রাঘবপুর ও চকসাতনে নীলকুঠি ছিল। নীলের চাষ হত এবং এই চাষের পিছনে কত অশ্রুজল বহেছে তা দীনবন্ধু মিত্র লিখে গেছেন। গৌড়ের পরেই কালিয়াচক অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রাম। বেশীর ভাগই মুসলমান অধ্যুষিত কালিয়াচক, বাঘরগঞ্জ, সুজাপুর, মোথাবাড়ী প্রভৃতি শিল্পের উৎপাদন কেন্দ্র মালদহ জেলাকে বিশ্ববাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে। কালিয়াচকের পরেই ফারাক্কা সেতু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গকে যুক্ত করেছে। দুরকে করেছে নিকট। মালদহের ফল প্রধানত আম। রেশম, পাট সবই ওপারে চলে যায়। আর ওপারের যত সুখ মালদহ বলে আয়, আয়, আয়। এখানেই মালদহ শেষ। ওপারে মুর্শিদাবাদ।

ফিরে আসি ঘোড়াপীর হয়ে মানিকচকে। মানিকচকের গঙ্গাঘাটে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা মৃতদেহ দাহ করে আর

দুরে থেকে দেখে বিহার অধুনা ঝাড়খণ্ডের রাজমহল। সেখানে সিরাজের আমলে শেষ স্বাধীনতার চিতাগ্নী প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল।

সিরাজ যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন কুশ তাঁকে রক্ষা করলনা। বাহারালের এক নির্মম ঘাতক সেখানে সিরাজকে চিনতে পেরে মানিকচক হয়ে রাজমহল নিয়ে গেল।

সিরাজ অসহায়। তার নিকট প্রাণভিক্ষা চাইল। অট্ট হাসি হেসে সে বলল ইংরেজের হাতে তোমায় ধরিয়ে দিলে আমি বহু ইনাম পাবো। তার পরের ইতিহাস কোন বাঙালী না জানে। মীরজাফর, মীরন্, মীরকাশিম, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, উমিঁচাদ তো সিরাজের জন্যই ইতিহাসে ঢুকে পড়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের পাশেই পিপ্‌লা গ্রাম। পিপ্‌লা মানেই সুবোধ মিশ্র। হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদারদের কৌলিকপূজা বহুদিন ধরে চলে আসছে সেখানে। আমবাগানে ঘেরা গ্রামটি। বিরাট ধনী বলতে কেউ নেই। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম এ গ্রামেই। কাজেই পিপ্‌লা গ্রামটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় হরিশ্চন্দ্রপুরের ইতিহাস লিখতে হলে। এই গ্রামেরই আমবাগানেই স্বরাজ ময়দান। এই ময়দানে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য বিনোবাভাবে, প্রফুল্ল ঘোষ, জ্যোতি বসু যেমন এসেছেন তেমনি স্বাধীনোত্তর যুগেও প্রাণ স্পন্দনে পিপ্‌লা গ্রাম মন্ত্রণা দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে

— ইংরেজ হটাও এই মন্ত্রে। পরবর্ত্তীকালে ময়দানের পাশেই পল্লী সমিতি গড়ে উঠেছে, পাঠাগার, হাইস্কুল ও 'মূক' বধির বিদ্যালয়, চরখা কেন্দ্র, খাদি গ্রামোদ্যোগ এবং আরো অনেক কিছু। জনকল্যাণ, সমাজ কল্যাণ ও নারী কল্যানের ধাতা-বিধাতা ছিলেন সুবোধ মিশ্র। উত্তরসূরীদের উদ্যম যেন ঝিমিয়ে এসেছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তুলসীহাটা গ্রাম।

পূর্ণিয়া জেলার অর্ন্তগত তুলসীহাটা তখন সুবে বাংলার অধীন। সুবে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার শাসন ছিল। তুলসীহাটায় ছিল থানা। বড় ডাকঘর। তুলসীহাটার স্টেশন ছিল বারসই। সেই তুলসীহাটা থেকে থানা চলে আসে হরিশ্চন্দ্রপুরে। তারপরে তুলসীহাটায় পঞ্চমুখী পাকা রাস্তা। প্রাইমারী থেকে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র অফিস, পশু হাসপাতাল হল। ১৩৫০ সনে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার গ্রামীণ গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হল ১৩৭১ সনে। জে.সি.আই. ক্রয়কেন্দ্র, সাব রেজেস্টারী অফিস প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৬৩ সালে। বিদ্যুৎ, সাবপোঃ অফিস, বিলাসবহুল সিনেমা হল প্রভৃতি নানা উন্নয়নের সাথে সাথে গড়ে উঠল ১১৮ বিঘা জমির মার্কেট কমপ্লেক্স। এ সবের মূলে এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের গ্রামীণ উন্নয়নে যেখানে যা হয়েছে তার প্রাণ পুরুষ এক কথায় বহুদিনের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্রের চেষ্টায়। হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রবাদপুরুষ শ্রী বীরেন্দ্রকুমার

মৈত্র বিহারের পরানপুরের বিধায়কের সাথে অনেক আলাপ আলোচনার পর ৩৪ নং জাতীয় সড়ককে যুক্ত করার ফলে বিহারের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা হতে চলেছে। যা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় আগামী প্রজন্মের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তুলসীহাটা এলাকার মধ্যে ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র এবং এখানে বহু জাতির বাস এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। যদিও তুলসীহাটায় চিকিৎসালয় অনেকগুলি হয়েছে। কিন্তু ১২৫ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'গরীব বান্ধব ঔষধালয়' একই ভাবে অত্র এলাকার সেবা করে আসছে এই গরীব বান্ধব ঔষধালয়ের পরবর্ত্তী প্রজন্মের ধারক ও বাহক শ্রী সুনীল কুমার মৈত্র একটানা ৫৪ বছর ধরে ব্ল্যাক বোর্ড মারফৎ বিভিন্ন খবর পরিবেশন করে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড করেছেন। গত ২৫শে নভেম্বর ২০০৩ সালে 'প্রতিদিন' খবরের কাগজ অনুযায়ী খবরের কাগজের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হল।

"একটানা চুয়ান্ন বছর ব্ল্যাকবোর্ডে খবর লিখে নতুন রেকর্ড"- গৌরাঙ্গ ভার্মা ঃ গাজোল ঃ

২৪ নভেম্বর ঃ- সকাল ১০টা বাজতেই হুমড়ী খেয়ে পড়েন তুলসীহাটার মানুষ। বোর্ডস্ট্যান্ডে জড়ো হয়ে গিলতে থাকেন তাজা খবর। না খবরের কাগজ সেঁটে নয়, ব্ল্যাকবোর্ডে খবর লিখে টাঙিয়ে রাখেন তুলসীহাটায় সুনীল কুমার মৈত্র তা

পড়তে দৈনন্দিন ভীড় জমান এলাকার উৎসাহী মানুষ। ১৯৫০ সালের ১লা জুলাই থেকে এই কাজ শুরু করেছেন সুনীল বাবু। ৫৩ বছর পেরিয়েও থেমে নেই সুনীল বাবুর বোর্ড পত্রিকা। প্রথমে তিনি এই পত্রিকার জন্য একটি বোর্ড ব্যবহার করতেন। এখন দৈনিক তিনটি বোর্ডে খবর লেখেন তিনি। বাড়ীর সামনেই এই বোর্ড স্ট্যান্ড। সকাল হতেই চক, ডাস্টার ও বোর্ড নিয়ে লিখতে বসে যান। তুলসীহাটার খবর, জেলার খবর, রাজ্যের খবর, দেশের খবর, এমনকী আর্ন্তজাতিক খবরও ঠাঁই পায় এই বোর্ড পত্রিকায়। সেখানে অশান্ত অসম, ক্যাটের, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত খবর পড়ে মুহূর্তেই জনমত তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আর এই জনমতই সূনীল বাবুকে এলাকার সেরা সাংবাদিকে বসিয়েছে। ফর্সা টকটকে ব্যক্তিত্বময় চেহারা তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়সেও অমলিন। কাবুলীওয়ালার মতো। দৃঢ়তা ও সৌন্দর্যর জন্য তুলসীহাটায় তিনি কাবুল বাবু নামে পরিচিত। ছাত্র জীবন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। স্বাধীনতার পরেও যখন তাঁর এলাকায় খবরের কাগজ পৌঁছতনা তখন থেকেই তিনি স্রেফ রেডিওর খবরের উপর ভরসা করে বোর্ড পত্রিকা শুরু করে ছিলেন। জরুরী অবস্থার সময় কংগ্রেসীদের কোপে পড়েছিল তাঁর এই পত্রিকা। কংগ্রেসীরা তখন বোর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারাই ভুল বুঝতে পেরেছিলেন বলে সুনীল বাবু জানান। তখন থেকে একটির পরিবর্তে

নতুন উদ্যমে দুটি বোর্ড লেখা শুরু হয়। নব্বই এর দশক থেকে শুরু হয় তিনটি বোর্ড। সুনীল বাবু বলেন, "সম্পূর্ণ ভাবেই রাজনীতিমুক্ত আমার এই বোর্ড পত্রিকা। যাঁরা খবরের কাগজ কিনতে পারেননা, যাদের রেডিও কেনার মত পয়সা নেই তাঁরা এই বোর্ড পত্রিকার উপরই নির্ভরশীল। তাই এই দায়বদ্ধতার জন্য তিপ্পান্ন বছর ধরে এই পত্রিকা চালিয়ে যাচ্ছেন। পেশায় সাধারণ চিকিৎসক সুনীল বাবু অত্যন্ত সাধারণ বাড়ীতে খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। করেন সমাজ সেবাও। দাদা বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র মন্ত্রী থাকাকালীন বাড়ীর জন্য কিছুই করেননি। সুনীলবাবু ও তা চাননি। এই হল তুলসীহাটার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইতিহাস কি বলে জানিনা। রাজা শশাংক এবং রামপালের গৌড়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওয়াড়ী, নামক একটি মহল্লা। এখানে চর্তুশালা মন্দির, বিরাট বাঁধানো পুকুর এবং দেব দেউল বলে একটি মন্দির খননকার্যে অনেক পুরাকীর্ত্তি ও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

যদিও সুযোগসুবিধা ছিল হরিশ্চন্দ্রপুরে কিন্তু কারিগরী কর্ত্তাদের সুপারিশে হরিশ্চন্দ্রপুরের বদলে কুমেদপুরে জংশন হল। রামপ্রসন্ন রায় সাংসদ চেষ্টা করেও এটা বন্ধ করতে পারেননি। কুমেদপুর যুক্ত করছে নিউজলপাইগুড়ি হয়ে আসামের রেলযোগাযোগ অপর দিকে কাটিহার হয়ে

বারাউনি সংযোগ। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন তরফের জমিদার বন্দনা বা কর্মের স্বীকৃতি এক কথা নয়। কোনখানে অতি দোষ যদি ঘটে থাকে আমি নিরূপায়। জমিদার বন্দনার সাথে সাথে জমিদার বংশের নগ্নরূপটাও আমার প্রবন্ধে তুলে ধরা প্রয়োজন। স্বাধীনোত্তর যুগে অর্থাৎ ১৯৫৫ সনে জমিদারী প্রথা বিলোপের পূর্বে হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদারকুল যে ভাবে প্রজাদের নিকট জুলুম করে খাজনা আদায় করতেন তা তুলে ধরছি আমার প্রবন্ধে। খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার সম্প্রদায় যে সকল প্রজা খাজনা দিতে অপারগ হতেন, তাদেরকে পাইক পিয়াদা দিয়ে ধরিয়ে এনে গরম জলে ডুবিয়ে আগুনের সেঁক দিতেন এবং জমিদারদের দোর্দন্ডপ্রতাপে প্রজাগণ সাইকেল বা ঘোড়ায় চড়তে পারতেন না। ১৯৫৫ সালে জমিদারী উচ্ছেদের ফলে হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং তাঁরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হতে এখনও বঞ্চিত। এ ঘটনাবলীর প্রমাণ পাওয়া যায় বনফুলের রচিত "দ্বৈরথ" নামক উপন্যাসে। হরিশ্চন্দ্রপুরের পর কুমেদপুরের ইতিহাসে আমি যদিও কিছু কিছু ঘটনাবলী আগেই উল্লেখ করেছি। এই কুমেদপুরেই সাদলীচকে ১৯৩২ সালে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত একটি এম.ই.স্কুলের গোড়াপত্তন হয়েছিল তা পরবর্ত্তীতে ১৯৬৪ সালে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয় এবং মিহাহাট ভেঙ্গে যখন কুমেদপুর হাট তৈরী হল তখন কাটিহার আর মালদহ এই

হাটে এসে হাটের ফায়দা ভাগ করে নিতে শুরু করল এবং মূল ফায়দা হাট কমিটি যা করেন তা স্কুলের জন্য মূলতঃ ব্যয় হয়। বর্ত্তমানে কুমেদপুরে একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় হরিশ্চন্দ্রপুরের সঙ্গে কুমেদপুরের সমস্যাবহুল রাস্তাটি নির্ম্মিত হতে চলেছে।

খ্যাতিহীন জ্ঞাতিহীন ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক গ্রাম নানা কারণে বিখ্যাত। শিল্প, কুটির শিল্প, প্রাচীন ইতিহাস, বিশিষ্ট বিদ্বান, গুণীজন, মহাপুরুষ ছড়িয়ে আছেন এই জেলায়। সেই ইতিহাস দীর্ঘায়িত করলাম না।

তবে জগজীবনপুর মালদহ জেলায় গৌড় পাণ্ডুয়ার মতোই একটি দিগন্ত উন্মোচিত করতে চলেছে। এখানকার খননকার্যে যে সমস্ত তথ্য বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে নালন্দার মত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের ইতিহাস লিখতে গিয়ে উল্লেখ করতে হয় আদিবাসী নেতা প্রয়াত শ্রী বীর বীড়সার নাম। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা থেকে প্রথমে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হতে আগত এই নেতা কৃতিত্বের সঙ্গে সমাজ সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। তার পরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উত্তরাংশে চন্ডীপুর নিবাসী প্রয়াত মৌলানা আবেদ

হোসেনের পৌত্র প্রয়াত মহঃ ইলিয়াস রাজী হরিশ্চন্দ্রপুরে ওয়াকার্স পার্টির শ্রষ্টা। তিনি তিনবার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা থেকে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। ইহা ছাড়া হরিশ্চন্দ্রপুরের দক্ষিণাংশে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবদান যেমন, প্রয়াত আবদুল বাসেদ মাষ্টার মশাই, প্রয়াত উজাল মন্ডল, মহাঃ ইউনুস, ডাঃ ফিরোজ আহমেদ, পেস্কার আলি মাষ্টার মশাই ও আবদুল ওয়াহেদ মিঞা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদার ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের টাল এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য। ১৯৬২ সালে হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রবাদপুরুষ প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্রের চেষ্টায় মালিওর বাঁধ তৈরী হওয়ায় পর টালের মানুষ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রকাশ থাকে যে, ১৯৬২ সালের বেশ কয়েক বছর আগে বন্যাজনিত কারণে দূর্ভিক্ষে একই সঙ্গে প্রায় দেড়শ জন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে মালিওর বাঁধ তৈরী হওয়ার টালের একফসলী জমি তিন ফসলীতে রূপান্তরিত হয়। ফলতঃ টালে আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেয়। টালে উন্নতির আর এক বিশিষ্ট নেতা ও শিক্ষাবিদ্ সাদলীচক হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও পরবর্ত্তীতে মিটনা হাই মাদ্রাসার রূপকার সকলের নিকট বাসেদ মিঞা নামে পরিচিত। টাল এলাকার শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বজন বিদিত। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন এক বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী

শিক্ষক। তিনি ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে আমার শিক্ষক। শুধু তিনি আমার শিক্ষকই ছিলেন না। আমি তাঁর শিষ্যও বটে। তদানীন্তন সময়ে আমরা ছাত্রদল সাদলীচক হাই স্কুলের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হিসাবে তাঁকে অ্যাখ্যা দিয়েছিলাম। সারা জীবন তাঁর আদর্শ ও উপদেশকে শিরোধার্য্য করে বর্ত্তমান ও আগামী জীবনে চলার চেষ্টা করেছি এবং চলব এই আশা রাখি। তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী বর্ত্তমানে কৃতিত্বের সাথে বিভিন্ন সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠত। তিনি শুধু শিক্ষকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক গুণবান ব্যক্তি। কোন দিন অন্যায়ের সাথে আপোষ করেন নি। অন্যায়ের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিবাদ ও এমন কি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সহ ব্যক্তিত্বের প্রমান ও যে কোন বিতর্কিত বিষয়ে স্বীকৃতি আদায় করা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রমান বহন করে ।

প্রয়াত উজাল মন্ডল (প্রধান) স্বাধীনোত্তর যুগ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদারদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে যেমন টাল এলাকার রাস্তাঘাট, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মোটেই ভোলার নয়। প্রয়াত আবদুল ওয়াহেদ মিঞা বিধায়ক ও বিশিষ্ট শিক্ষক হিসাবে কৃতিত্বের সাথে কাজ করে গেছেন। আড়ম্বরহীন এই ব্যক্তিটি সরলভাবে জীবন যাপন করে গেছেন। সদা হাস্যময় এই ব্যক্তিটি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আজীবন কংগ্রেসের বিশিষ্ট পদে ও পরবর্ত্তীতে

হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক হিসাবে কাজ করে গেছেন।

অর্জুনা গ্রামের প্রয়াত পেস্কার আলি মাষ্টার মশাই স্বাধীনতার জন্য তাঁর সহপাঠী প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র কুমার মৈত্রের সহিত স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন বিভিন্ন জনহিতকর সংগঠনের সহিত যুক্ত ছিলেন। শ্রীবীরেন্দ্র কুমার মৈত্রের সঙ্গে এক সাথে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্ত্তীতে ১৯৭২ সালে জনতা পার্টির টিকিটে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান। এই রকম অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি টালের উন্নয়নের জন্য সবরকম চেষ্টা করে গেছেন। বর্ত্তমানে টাল এলাকা শিক্ষা দীক্ষায় অনেকটা এগোলেও রাস্তাঘাট বিশেষ করে বর্ষার সময় হরিশ্চন্দ্রপুরের সহিত জনসংযোগ বিছিন্ন হয়ে যায়। সম্প্রতি প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র কুমার মৈত্র, যিনি সকলের বিশুদা নামে পরিচিতি তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে ফতেপুর পর্যন্ত দুর্গম রাস্তাটি পাকা হয়েছে। ফলে বর্ষার সময় টাল এলাকার জনগণকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয় না। তাঁর চেষ্টায় হরদম নগরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্ত্তমানে ডাক্তার থাকেনা। জীবনের অন্তীম লগ্নে এসেও তিনি চেষ্টা করছেন যাতে সেখানে একজন স্থায়ী ডাক্তার নিয়োগ হয় এবং টালের মুমুর্ষু রোগীরা বিনা চিকিৎসায় যেন না মারা যায়। হরিশ্চন্দ্রপুরের এক অংশে মিলন গড় সেখানকার এক বিশিষ্ট সমাজসেবক

প্রয়াত ডাঃ জাকারিয়া, প্রয়াত মোহাঃ মুসা মাস্টার মশাই মিলনগড়ের উন্নতির জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। মিলনগড় স্টেশনটি তাঁর এবং প্রয়াত মাওলানা ওসমান গনি যিনি বুলবুলে বাঙ্গাল নামে অ্যাখ্যায়িত হয়েছিলেন এবং প্রয়াত মাওলানার অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রয়াত মাওলানা সাজ্জাদ আলির ঐকান্তিক চেষ্টায় সর্ব্বপরি প্রয়াত রামপ্রসন্ন রায় এম. পির অবদানে প্রতিষ্ঠিত হয় হরিশ্চন্দ্রপুর ও ভালুকার সাথে হরদমনগর ও টালের এক অংশের মিলন হওয়ায় এই ষ্টেশনটির নাম করণ হয় মিলনগড়। ইহা ছাড়াও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দক্ষিণাংশে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রয়াত প্রদীপ রঞ্জন পোদ্দার।

শ্রী পোদ্দারের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র কুমার মৈত্রের অবদানে দৌলতনগর হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রয়াত প্রদীপ রঞ্জন পোদ্দার মহাশয় প্রথমে ষাটের দশকে সাদলীচক হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তীতে শ্রী মৈত্রের সান্নিধ্যে এসে দৌলতনগর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন। দারুন বিচক্ষনতার সহিত শিক্ষকতা করে তিনি প্রয়াত হন। প্রয়াত প্রদীপ রঞ্জন পোদ্দারেরও ও আমি ব্যক্তিগত ভাবে ষাটের দশকে ছাত্র ছিলাম। তাঁর অগণিত ছাত্র ছাত্রী বহু সম্মান জনক পদে বর্তমানে অধিষ্ঠিত।

এবারে আসি পৈত্রিক বাসস্থান নানারহির কথায়। বাংলা

১৩৫৯ সালের ১লা ফাল্গুন নানারাহির মাটিতেই জন্মেছি। ঠাকুরদাদা প্রয়াত হাজী রমজান মন্ডলের কাছে ছোট বেলায় গল্প শুনতাম তাঁর বাবা প্রয়াত কেরাতুল্লা মন্ডল ইংরেজী ১৮৯৬ সালে কিশোর রমজানকে নিয়ে সুদুর পাকা নারায়ণপুর (রাজশাহী) যা অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত। সেখান থেকে এসে প্রয়াত কেরাতুল্লা মন্ডল ১৮৯৬ সালে নানারহি গ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্ত্তীতে অন্যান্য নানা বংশধরের আগমনে গ্রামটির সংমিশ্রিত নাম হয় নানারহি। কেরাতুল্লা মন্ডলের প্রয়াণের পর ঠাকুরদাদা প্রয়াত হাজী রমজান মন্ডল অত্র এলাকার জমিদারের দৌর্দন্ডপ্রতাপশালী মন্ডল হিসাবে কাজ করেন। এবং তাঁর নেতৃত্বে প্রজারা সমান বিচার পেতেন। তিনি খুব অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি হলেও তার মনোভাব ছিল কঠোর। অন্যায়ের সাথে কোন দিন আপোষ করেননি। তাই তাঁকে পরবর্ত্তীতে অত্র এলাকার কতিপয় লোকের নিকট অনেক শাস্তি পেতে হয়েছিল। এই গ্রামে রাস্তাঘাট না থাকলেও এখন বৈদ্যুতিক সংযোগ, টেলিফোনের পরিষেবায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। এই গ্রামে প্রথম বি.এ. পাশ করে গ্রাজুয়েট হয়েছিলাম প্রয়াত ঠাকুরদাদা হাজী রমজান মন্ডলের ঐকান্তিক চেষ্টা ও তাঁরই আগ্রহে। তাছাড়া বাবা প্রয়াত মাজেদ আলি ও সর্ব্বোপরি কাকা জীবন প্রয়াত সাজ্জাদ আলির অবদানতো মোটেই ভোলার নয়। বর্ত্তমানে শিক্ষিতের হার অনেক হলেও কৃষ্টি,

সংস্কৃতি ইত্যাদিতে পিছিয়ে আমার এই জন্মস্থান নানারহি। সংক্ষেপেই শেষ করা হল নানারহির ইতিহাস।

সবিনয়ে লেখক পরিচিতি এই ভাবেই দেওয়া হল। এরপর মালদহ জেলার বিশিষ্টতার প্রমান্যরূপ দেবার চেষ্টা করার সঙ্গে থাকছে হরিশ্চন্দ্রপুরের ভৌগলিক পরিচয়।

একনজরে হরিশ্চন্দ্রপুরের কিছু মূল তথ্য নিম্নে দেয়া হল ঃ

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মোট এলাকা - ৩৭৭.৭৬ কিলোমিটার।

১। গ্রাম পঞ্চায়েত মোট ১৬ টি।

২। গ্রাম ২১৩ টি।

৩। মৌজা ১০৫ টি।

৪। চাষযোগ্য জমি ৬১৫১০ একর।

৫। বাসযোগ্য জমি ৩৩৩.২০ একর।

৬। পশু হাসপাতাল ৫ টি।

৭। পশু সার্জেন ৫ জন।

৮। পশু উপকেন্দ্র ২টি।

৯। পশু সহকারীকেন্দ্র ২টি।

১০। খাল ২টি

১১। পুকুর ৩০৭ টি।

১২। সেচ ব্যবস্থা ৪৪টি।

১৩। নলবাহিত জল গ্রাম ২৪ টি।

১৪। শিল্প ঃ টালি, ইঁট, চানাচুর বেকারী, লোহার আসবাব, দর্জি তেলকল, গুল ফ্যাকটরী, জুতা, চাল,গম, তেল মিল, মাকনা, মোটর মেরামতি। পূর্বেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিস্তারিত তথ্য দিয়ে থাকলেও পুনরায় এক ঝলকে—

১৫। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ২১৪ টি। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, জুনিয়ার হাই স্কুল, উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, জুনিয়র, সিনিয়র ও হাই মাদ্রাসা সহ মোট ৩৯ টি।

১৬। হাসপাতাল ২ টি। শয্যাসংখ্যা ১০০।

১৭। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ৪ টি। শয্যাসংখ্যা ৬ টি।

১৮। বিদ্যুতায়িত গ্রাম ১০০ টি।

১৯। রাস্তা ৬৪২ কিলোমিটার।

পি.ডব্লিউ.ডি ৪৯ কিলোমিটার।

জেলা পরিষদ ৩০ কিলোমিটার।

পাকা কাঁচা ২৬৭ কিলোমিটার।

ফেরী ৬ টি।

২০। ডাকঘর ২৭ টি।

২১। ব্যাঙ্ক ১২ টি।

২২। সমবায় সমিতি ৪৪ টি।

এক নজরে মালদহ জেলার কিছু তথ্য। তথ্যগুলি ২০০১ সালের আদম সুমারী, গেজেট নোটিফিকেশন জেলার স্টেটিসটিক ও অন্যসূত্র থেকে সংগৃহীত —

১। আয়তন ৩৭৩৩ বর্গ কি.মি.

২। মৌজার সংখ্যা ১৭৯৮ টি।

৩। গ্রামের সংখ্যা ৩৭০১ টি।

৪। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ১৪৫৩৯৯ মি.মি.

৫। জনসংখ্যা ৩২৯০, ১৬০ জন (২০০১ আদমসুমারী)

পুরুষ — ১৬,৮৯,৪০৯ জন।

মহিলা — ১৬,০০,৭৫১ জন।

৬। জনসংখ্যায় রাজ্যে স্থান ১৪

৭। শিক্ষিতের সংখ্যা মোট ১৩,৪৮২৩০ জন (২০০১

আদমসুমারী)

পুরুষ - ৮,০০৫৯১ জন।

মহিলা - ৫, ৩৭৬৩৯ জন।

৮। শিক্ষিতের শতকরা হার মোট ৫০.৭১ শতাংশ

পুরুষ - ৫৯.২৪ শতাংশ।

মহিলা - ৪১.৬৭ শতাংশ।

৯। জনবসতির ঘনত্ব প্রতি কিমি. ৩৮৮১ জন।

১০। জনবসতি রাজ্যে স্থান ৮।

১১। প্রতি ১০০০ জন পুরুষের মধ্যে মহিলা ৯৪৮ জন।

১২। প্রতি ১০০০ জন হিসাবে রাজ্যে ৬।

১৩। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার এই জেলায় বসবাস করে ৪.১০ শতাংশ।

১৪। গত এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৪.৭৭ শতাংশ।

১৫। গত এক দশকে রাজ্যে স্থান ১৭।

১৬। ৬ বছর বয়স পর্যন্ত জনসংখ্যা মোট

মোট ৬,৩১,৫৪১ জন।

বালক ৩২,২১০৪০ জন।

বালিকা ৩,৪০,৫০১ জন।

১৭। জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৮।

১৮। জেলা পরিষদের মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৩৩ জন।

১৯। তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৯ জন।

মহিলা সংখ্যা ১৪ জন।

২০। জেলায় পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ১৫ টি।

২১। সভাপতির আসন ১৫ জন।

পুরুষ ৯ জন।

মহিলা ৬ জন।

২২। জেলায় পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৩৮৪ জন।

২৩। জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৪৭ টি।

২৪। ঐ নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ২১৯২ জন।

২৫। গ্রাম সংসদের সংখ্যা ২০১৭ টি।

২৬। জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সংখ্যা ১০ টি।

২৭। বিধায়ক নির্বাচন ক্ষেত্র ১১টি। মোট ১১ জন বিধায়কের মধ্যে পুরুষ ৮ জন, মহিলা ৩ জন।

২৮। সাংসদ নির্বাচন ক্ষেত্র ১ (অসংরক্ষিত) মোট ৪ টি।

২৯। ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৭৪৪৭৫ টি আগের হিসাব অনুপাতে।

৩০। কৃষকের সংখ্যা ২,৮৮৯৮৭ জন

৩১। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ২,৩৮,০৯২ জন

৩২। জেলার বৃহত্তম পঞ্চায়েত সমিতি গাজোল পঞ্চায়েত সমিতি। মোট পঞ্চায়েতের সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৭ জন।

৩৩। জেলায় ক্ষুদ্রতম পঞ্চায়েত সমিতি যুগ্মভাবে ওল্ড মালদহ ও বামনগোলা পঞ্চায়েত সমিতি।

৩৪। জেলার বৃহত্তম গ্রাম পঞ্চায়েত হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। সদস্য সংখ্যা ২৫ জন।

৩৫। জেলার ক্ষুদ্রতম গ্রাম পঞ্চায়েত রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত।

৩৬। মালদহ জেলা পরিষদ পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় ৭ টি।

৩৭। মালদহ জেলা পরিষদ পরিচালিত পরিদর্শন

ডাকবাংলো ৬ টি।

৩৮। মালদহ জেলা পরিষদ পরিচালিত বাজার গৃহ ৬ টি।

৩৯। মালদহ জেলা পরিষদ পরিচালিত ফেরীঘাট ৩৭ টি।

৪০। মহকুমা ২ টি ইংরেজবাজার ও চাঁচল।

৪১। পুলিশ থানার সংখ্যা ১১ টি।

৪২। জেলা গ্রন্থাগার ১ টি।

৪৩। পুলিশ ফাঁড়ী ৩ টি।

৪৪। গ্রন্থাগার ১৫৯ টি।

৪৫। শিক্ষক প্রশিক্ষন কেন্দ্র ২ টি।

৪৬। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৮ টি।

৪৭। উচ্চ মাধ্যমিক হাই মাদ্রাসা ১৪ টি।

৪৮। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫৫ টি।

৪৯। হাই মাদ্রাসা ৩২ টি।

৫০। প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৫১ টি

৫১। জুনিয়ার হাইস্কুল ৪৭ টি।

৫২। জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা ১৪৮ টি।

৫৩। সাধারণ হাসপাতাল ১ টি।

৫৪। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৭৩ টি।

৫৫। রেজেস্ট্রি অফিস ১০ টি।

৫৬। সরকারী অতিথি আবাস ৬ টি।

এখানেই শেষ করা হল মালদহ জেলার কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য। এবারে আসা যাক বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুরের একনজরে কিছু সমস্যা। প্রতিবছর বর্ষা আসলেই হরিশ্চন্দ্রপুরের সাধারণ মানুষের উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। হরিশ্চন্দ্রপুরে কোন জলনিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় হরিশ্চন্দ্রপুর বর্ষার জলে থৈথৈ করে। হরিশ্চন্দ্রপুর একটু উন্নত বাজার বলে থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাল্লা দিয়ে চলে আসছে হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য। গ্রামীন পরিষেবার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে একটু হাফ্ ছেড়ে বাঁচার জন্য মানুষ হরিশ্চন্দ্রপুরে এসে ভিড়করে যত্রযত্র বাড়ী তৈরী করছে কেউবা একটুখানি উন্নত পরিষেবার জন্য মানুষ হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রীক হয়ে পড়ছে। মানুষের চাহিদা বিপুল। চাহিদা পূরণ করতে এসে সাধারণ মানুষ যত্রযত্র বাড়ী তৈরী করার ক্ষেত্রে অথই জলে বিপন্ন। প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। জল নিকাশের কোন স্থায়ী ড্রেন নেই। বর্ত্তমান বছরে ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে তদানীন্তন সাংসদ ও বর্তমানে ভারত সরকার জলসম্পদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী

শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর সাংসদ কোটা একটি হাই ড্রেনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু কারিগরী কারণে ও ঠিকাদারের অবদন্যতায় কাজটি বর্তমানে অসম্পন্ন। এখনও রাস্তার পার্শ্বে সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে মাননীয় সাংসদের কোটা থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরে জল নিষ্কাষনের জন্য হাইড্রেনের কাজ চলছে। হাইড্রেন কিন্তু হচ্ছেনা বর্ষা আসন্ন দেখে ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ দোকানের সামনে নিজ থেকে মাটি ভরেই ড্রেন বন্ধ করছে। সাধারণ মানুষ জানেনা কবে প্রশাসন ও ঠিকাদারের চেতনাবোধ জাগ্রত হবে এবং হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী কখন দীর্ঘদিনের এই জল সমস্যা থেকে রক্ষা পাবে। প্রতিবছর বর্ষা আসলেই সাধারণ মানুষের অসন্তোষ মাথা চাড়া দেয়। কার বাড়ীর জল কার উঠোনে প্রবেশ করবে তাই নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝগড়া বাধবে এমনকি মারামারিও হয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা বিগত দিনে দেখা গেছে। কাজেই এমতাবস্থায় যদি প্রশাসন দৃষ্টিপাত না করে তবে বর্ষার মরশুমে মানুষের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়বে। পি.ডবলিউ.ডি. রাস্তার দিকে কোন নজর দিচ্ছেনা। বড় বড় পাকা বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তার বেহাল অবস্থা। মাঝে মাঝে ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে। অনেক দুর্ঘটনাও ঘটছে। রাস্তার পাশে অনেক গুমটি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে। যে যার ইচ্ছামত সরকারী জমি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। একটি মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ে বর্ষার সময়ে ছাত্র ছাত্রীরা বিদ্যালয় যাওয়াতে ভীষণ অসুবিধায় পড়ে। এর সঙ্গে হুমড়ী খেয়ে পড়ে - থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা যাত্রী সাধারণ। বাসের কোন নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ড নেই। নেই প্রস্রাবাগার, শৌচাগার, বিশ্রামাগার। রিক্সাওয়ালাদের চরম ঔদ্ধত্যপনা বিরাজমান। নিজ মর্জি অনুযায়ী রিক্সা ভাড়া দাবী করে সাধারণ লোককে ভীষণ অসুবিধায় ফেলছে। অস্থায়ী বাসস্ট্যাণ্ডে তাদের দৌরাত্ম অবাধগতিতে চলছে। বাস ঢুকলেই প্যাসেঞ্জার নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব রিক্সাওয়ালারা। পাল্লা দিচ্ছে কে আগে প্যাসেঞ্জার নিবে। ফলতঃ অস্তায়ী বাসস্ট্যাণ্ডে দুর্ঘটনাও ঘটছে। সাধারণ মানুষের চরম দুর্গতি। প্রশাসনের দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজন। প্রশাসনের কুম্ভকর্ণের ঘুম কখন ভাঙবে তাই এখন দেখার বিষয়। হরিশ্চন্দ্রপুর জমিদারের জায়গা। কোনদিন সমাজ বিরোধী ছিলনা হরিশ্চন্দ্রপুরে। বিগত দিনে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি জনৈক ব্যক্তি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার পরে বাড়ী যাওয়ার ক্ষেত্রে টাকা ছিনতায়কারীদের হাতে পড়ে। সাইকেল চুরির ঘটনা অবারিত। এমন কি মটর সাইকেল চুরির ঘটনাও ঘটছে। এমতাবস্থায় প্রশাসনের আমোঘ দৃষ্টি আকাশের দিকে চেয়ে। তাই আমরা এখন প্রশাসনের দিকে চেয়ে আছি। একটু উন্নত পরিষেবা, নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রশাসন নজর দিলে জনসংখ্যার দিক থেকে

হরিশ্চন্দ্রপুর সদরটিকে যদি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করা যায় এবং বহুদিনের দাবী হরিশ্চন্দ্রপুরে যদি একটি কলেজ স্থাপনে সহায়তা করে সমগ্র হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আপামর জনগনের চাহিদা মিটাতে প্রশাসন ও হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা এগিয়ে আসেন তবেই মিটবে হরিশ্চন্দ্রপুরের দীর্ঘদিনের সার্বিক সমস্যা। নতুবা হরিশ্চন্দ্রপুর বাসীর নিকট স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে এবং আগামী দিনে উন্নত জীবনযাত্রাই হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সাধারণ মানুষ আশায় ভর করে তাকিয়ে থাকবে। হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের জনসংখ্যা আরো বাড়বে। সমস্যা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতম আকার ধারণ করবে। এই প্রসঙ্গে আমার প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর থেকে বারদুয়ারী রাস্তার যে বেহাল অবস্থা সেটাও উল্লেখ না করে থাকতে পারছিনা। হরিশ্চন্দ্রপুর ২নং ব্লক থেকে ভায়া তেলজান্না মিহা ও বর্তমান গোবরাহাট, দৌলত নগর পর্যন্ত রাস্তার যে কি করুণ অবস্থা তা অত্র এলাকার জনগনেই বুঝেন। ১৯৬২ সালে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় তদানীন্তন সেচ মন্ত্রী অজয় মুখার্জীকে দিয়ে যা মালিত্তর বাঁধ নামে খ্যাত তা তৈরী করেছিলেন বর্তমানে তার এই করুণ চেহারা। জানিনা প্রশাসনের অমোঘ দৃষ্টি কখন পড়বে এবং শুভবুদ্ধির উদয় হবে এই রাস্তা পূর্ণনির্মাণে।

এই প্রবন্ধের শেষে আসা যাক হরিশ্চন্দ্রপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তির

পরিচিতিতে। যদিও প্রবন্ধের শুরুতেই ব্যক্তিগুলির ব্যক্তিত্বের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেছি কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা না করলে আমার এই প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তাই বিশিষ্ট ব্যক্তি পরিচিতি দিয়েই শেষ করছি আমার এই "একশ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর প্রবন্ধটি।"

১। **প্রয়াত সৌরেন্দ্রমোহন মিশ্র** ঃ অসহযোগ আন্দোলন-১৯৪২ এর আন্দোলনের পথিকৃৎ ও অবিসম্বাদী নেতা। পরবর্ত্তীকালে উপমন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তিনি মালদহে খাদি প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন। বিশিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করেও গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দেন। সরল জীবন যাপন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর চিকিৎসার অর্থ পর্য্যন্ত ছিলনা। ১৯৪২ সালে তাঁর জন্য তাঁর সমস্ত পরিবার প্রশাসনের দ্বারা ভীষণভাবে নিগৃহীত হন। স্বাধীনোত্তর যুগে যখন সারা দেশে সাম্প্রদায়িক আগুন প্রজ্বলিত তখন তিনি মালদহে শান্তিরক্ষায় জীবনযাপন পরিশ্রম করেন।

২। **প্রয়াত সুরেন্দ্রবালা রায়** ঃ সারা জীবন কংগ্রেস কর্মী। মালদহের প্রথম মহিলা কর্মী। স্বামী দ্যুতিধর রায় একমাত্র পুত্র বোমকেশ রায় সহ সমগ্র পরিবার দেশের জন্য আত্ম নিয়োগ করেন। পুত্র সর্পাঘাতে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পরেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

৩। প্রয়াত রামহরি রায় ঃ অবিসম্বাদী কংগ্রেস নেতা। বিভিন্ন আন্দোলনে কারাবরন করেন। ১৯৫২ সালে হরিশ্চন্দ্রপুর হতে বিধায়ক নির্বাচিত হন। তিনি স্কুল বোর্ডের সভাপতি ও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তাঁর সহধর্মিনী উমা রায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস ও গঠনমূলক কর্মী। তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন। কন্যা শিক্ষালয় সমিতি তাঁর অন্যতম কীর্তি। হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন কংগ্রেস কর্মী। সেই যুগে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম।

৪। প্রয়াত সুবোধ কুমার মিশ্র ঃ তিনি ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কংগ্রেস নেতা। ১৯৪২ এর হরিশ্চন্দ্রপুরের আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তাছাড়া জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন চিরদিন অত্যন্ত সরব। পাইকদের সফল জমির আন্দোলনে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি জেলা কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসে থেকেও প্রদেশ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী কিরণশঙ্কর রায়ের বিধান সভায় উপনির্বাচনে তিনি বিরোধিতা করেন এবং তিনি রামহরি রায়কে মালদহ জেলা কংগ্রেস প্রার্থী ঘোষণা করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের প্রজা সোসালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পরে সংগঠনমূলক কাজে এবং বিনোবাভাবের গ্রামদান আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি পিপ্‌লা গ্রামে অনেকগুলি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান

গঠন করেন। তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী সৌরিন্দ্র মোহন মিশ্রের সাথে রাজনৈতিক মত পার্থক্য থাকা সত্তেও সুবোধবাবুকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করে গেছেন নানা গঠনমূলক কাজ।

৬। রামপ্রসন্ন রায় ঃ— হরিশ্চন্দ্রপুরের সুসন্তান। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ। ব্যক্তিত্ব ছিল অগাধ। তিনি জেলা বোর্ডে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম নির্বাচিত হন। জেলা বোর্ডের সদস্য হন এবং চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। তিনি সমগ্র জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন। তিনি পরে জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে রাজ্য সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

৭। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ঃ- দেশিকোত্তম শাস্ত্রী মহাশয় হরিশ্চন্দ্রপুরের সুসন্তান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব কাছের লোক ছিলেন। তাঁর স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভ সগৌরবে বিদ্যমান।

কিন্তু তাঁর গ্রামের ও কোলকাতার বসতবাটী অবলুপ্তির পথে যেতে বসেছে। শাস্ত্রী মশায়ের জীবন ৩য় প্রজন্মেই শেষ হয়ে গেল। ধূলায় যেতে বসেছে ও মিশে যাচ্ছে তাঁর বসতবাটী কোলকাতায়।

৮। শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র ঃ- ১৯২৭ সালের

হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা গ্রামে জন্ম। পিতা প্রয়াত কালীপদ মৈত্র। বিশু মৈত্র নামে পরিচিত শ্রী বীরেন্দ্রকুমার এ জেলার এক বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব। প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী "বিশুবাবু" প্রথমে কংগ্রেস, পরে জনতা ও সর্বশেষে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক এবং প্রাক্তন রাজ্যমন্ত্রী। আজীবন গান্ধীবাদী এই পরোপকারী মানুষটির প্রভাব জেলার পরিধি ছেড়ে বাহিরেও বিস্তৃত। রাজনৈতিক চরিত্রাপেক্ষা সমাজ সেবাই তাঁর প্রাণের স্ফূর্তি। অসংখ্য জনহিতকারী সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি, মালদহ শাখার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৯। প্রয়াত আবদুল বাসেদ মিঞা ঃ— আবদুল বাসেদ মিঞার জন্ম ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী হরিশ্চন্দ্রপুরের মিটনা সংলগ্ন বেলশুড় গ্রামে। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়া সেরে হরিশ্চন্দ্রপুর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মালদা কলেজ থেকে অনার্স সহ স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.পাস। পড়াশুনা সেরে সাদলীচক হাই স্কুলে শিক্ষকতায় যোগদান। পরবর্তীতে মিটনা হাই মাদ্রাসার রূপকার। সারা জীবন শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থেকে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করে ছিলেন। তিনি বহু গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী রেখে গেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর ছাত্র। অবশেষে চাকুরীরত অবস্থায় ১৯৮৯ সালের ১৬ ই জুন সকলের মায়া ত্যাগ করে অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

১০। সর্বজন শ্রদ্ধেয়, মালদহ জেলার কূল গৌরব ও জন্মসূত্রে হরিশ্চন্দ্রপুর ভূমির তদানীন্তন শিশু ও মালদহ জেলার প্রাণ ও সুসন্তান, তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রায় দুই লক্ষেরও অধিক লোকের প্রায় স্বল্পমূল্যে জীবনে পার্থিব রশ্মি দিয়েছিলেন। সম্প্রতি প্রয়াত সেই প্রবাদ পুরুষঁ ডাঃ পিনাকী রঞ্জন রায় মহাশয়ের করকমলে নিবেদিত এই কথামালাটি উৎসর্গ করলাম।

"মালদহ জেলার সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রা চলেছে আপন মনে, আঁকা বাকা, কত উঁচু-নীচু-রাজপথ বেয়ে। তোমার জীবনে এসেছিল কতশত অন্ধযাত্রী, তাইতো, তুমি ব্রত নিয়েছিলে" অন্ধজনে 'দেহ আলোর পথে।

তোমার জীবনে দেখেছিলে, তুমি কত শত-অন্ধযাত্রী,
তোমার পরশে নতুনরূপে আলোকিত হয়ে,
তারাও কত রশ্মি নিয়ে, কোথায় চলে গেছে
তা জাননা তুমি। তুমি এখন চলে গেছো
তাই কেউ আসবেনা তোমার কাছে রশ্মি নিতে
তোমার খবরও আর রাখবেনা
কেউ কোনদিন।।

স্নেহধন্য ও অদরের
।। আবদুল ওয়াহাব।।

পরবর্তীতে ৩য় সংস্করণ প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।
ইন্‌শাল্লাহ্।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

প্রচ্ছদপট
শ্রী মনোতোষ মণ্ডল
হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ

মুদ্রক
এস.ভি.অফসেট
১৩ ভি, আরিফ রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০৬৭

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো, কোলকাতা - ৭০০০০৯

প্রাপ্তিস্থান
মালদা মডেল বুক ডিপো
মালদা
বীণাপাণী বুক ডিপো
মালদা কলেজ গেট, মালদা
আলম বুক ডিপো
হরিশ্চন্দ্রপুর
রায় বুক ডিপো,
হরিশ্চন্দ্রপুর
হরিশ্চন্দ্রপুর বুক ডিপো
গ্রাঃ পঃ অফিস সংলগ্ন, হরিশ্চন্দ্রপুর
আইডিয়াল বুক ডিপো
হরিশ্চন্দ্রপুর
কমলা বুক ডিপো
হরিশ্চন্দ্রপুর বাস স্ট্যান্ড, মালদা
বুকস্ এন্ড বুকস্
চাঁচল
অভিনন্দন বুক সেন্টার
চাঁচল
বইঘর, চাঁচল
স্টুডেন্ট বুকস্ ডিপো
চাঁচল, মালদা